বিষয় উপস্থাপনাঃ গৌতম সরকার,

সহঃকারী অধ্যাপক,

ইতিহাস বিভাগ,

এস, আর, ফতেপুরিয়া কলেজ,

বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও বানীঃ

বিষয় সংক্ষেপঃ খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময় ভারতের ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে নূতন অনুসন্ধান ও সংস্কারের দ্বারা চিনহিত হয়েছিল। দর্শনের ক্ষেত্রে এই নূতন অনুসন্ধানস্পৃহা বৈদিক যুগের শেষ দিকে উপনিষদে প্রতিফলিত হয়েছিল। উপনিষদ বৈদিক ধর্ম এবং জীবনযাপন-পদ্ধতিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে, তত্বগত দিক থেকে তাঁদের দৃঢ়তর ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে সেখানে নবীন প্রাণের সঞ্চার করতে চেয়েছিল। ইতিহাসে পরিব্রাজক এবং শ্রমণ নামে পরিচিত একদল সন্ন্যাসী এই নূতন চিন্তার অগ্রদুত ছিলেন।এই সন্ন্যাসীরা বা শ্রমণেরা সংসার ও কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা বেদের অধিকার ও তাঁর উপর প্রতিষ্টিত সমাজব্যবস্থা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্টানকে অস্বীকার করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের উপর প্রতিষ্টিত বর্ণভেদ ব্যবস্থাও তাঁরা মানেননি। মানুষের জীবনে স্বর্গীয় দাক্ষিণ্যের উপযোগিতাও তাঁরা অস্বীকার করেছিলেন। এই পর্বেই ভারতীয়গণ উপজাতি জীবন অতিক্রম করে সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছিল। অর্থনীতিতে পশুপালন পর্বের পর কৃষিভিত্তিক জীবন শুরু হয়েছিল। অনেকগুলি নগর গড়ে ওঠায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। এরূপ পরিস্থিতিতেই সমগ্র মানুষের মুক্তির পথ রূপে বিস্তার লাভ করতে শুরু করেছিল প্রতিবাদী ধর্মগুলির। এর মধ্যে অন্যতম বৌদ্ধধর্ম। সনাতন ঐতিহ্য কে রক্ষা করেও মানুষের জীবনকে কষ্টের হাত থেকে মুক্তির উপায় বাতলেছিল, যাহার মধ্যে বেদ উপনিষদের ছায়া থাকলেও স্বতন্ত্রতা বর্তমান।ভারতের মূল সুরের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল এই ধর্ম দর্শন।

মূলবিষয়ঃ-

পরবর্তী বৈদিকযুগের পর ভারতীয় সমাজ চারটি শ্রেণী বা বর্ণে বিভক্ত হয়ে পড়ে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র। প্রতিটি শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট কাজ ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা ছিল সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী। ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজের শিরোমণি। ব্রাহ্মণদের পরই সমাজে স্থান ছিল ক্ষত্রিয়দের। তাঁরা যুদ্ধ করতেন, শাসনকার্য চালাতেন এবং রাজস্ব আদায় করতেন। ব্যবসাবাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকাজ ছিল বৈশ্যদের পেশা। তারাই সবচেয়ে বেশি কর দিত। তাঁদের অবশ্য বেদ অধ্যয়নে বাধা ছিল না। শুদ্ররা এই তিন উচ্চবর্ণের সেবা করত। এই বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা অবশ্য সহজ ও সরল ছিল না। প্রতিটি বর্ণের মধ্যেই উপবর্ণ ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণী ছিল। এই শ্রেণীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তী বৈদিক যুগে ২৭ প্রকার পুরোহিতের নাম পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়দের মধ্যেও এরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়। বৈশ্যদের মধ্যে বৃত্তি অনুযায়ী বিভিন্ন উপশ্রেনী গড়ে ওঠে। শূদ্ররাও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বৈশ্যদের অর্থকৌলিন্য থাকলেও জন্মকৌলিন্য না থাকায় তাঁরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে বঞ্চিত ছিল। এর জন্য তাঁরা

ব্রাহ্মণদের দায়ী করত। ক্ষত্রিয়রা ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একাধিপত্যের বিরোধী ছিলেন। ক্ষত্রিয়দের এই ব্রাহ্মণ- বিরোধী মনোভাব জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন ক্ষত্রিয়।

বর্তমান নেপালের তরাই অঞ্চলে অবস্থিত সেকালের কপিলাবস্তু গণরাজ্যের শাক্য জাতির নায়ক শুদ্ধোধনের পুত্র ছিলেন গৌতম। তাঁর আসল নাম ছিল সিদ্ধার্থ। লুম্বিনী গ্রামে তাঁর জন্ম। জন্মের কিছুপরেই তাঁর মা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এই মাতৃহীন শিশু ছোটবেলা থেকে অতুল ঐশ্বর্যে মানুষ হলেও সিদ্ধার্থ ঐশ্বর্যের প্রতি সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। ষোল বছর বয়সে গোপা বা যশোধরা নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে সিদ্ধার্থের বিবাহ হয়। কালক্রমে তাঁর পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁর নাম রাখা হয় রাহুল। পুত্র অথবা পত্নীর আকর্ষণ কিন্তু সিদ্ধার্থকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারলো না। মানুষের জীবনে জরা, বার্ধক্য, মৃত্যু প্রভৃতির দুঃখ তাঁকে সংসারের প্রতি ক্রমশ অনাসক্ত করে তোলে। অবশেষে একদিন মানবজীবনে দুঃখের অবসানকল্পে জীবাত্মার মুক্তির পথ খুঁজে বের করার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এই ঘটনাটি ' মহাভিনিষ্ক্রমণ ' বলে পরিচিত।

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ অনেক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, বহু কৃচ্ছ্রসাধন করেন, বহুদেশ পর্যটন করেন, কিন্তু দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারলেন না। অবশেষে গয়ার নিকট নিরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে এক বৃহৎ অশ্বত্থগাছের নীচে সিদ্ধার্থ তপস্যায় নিমগ্ন হন। অশ্বত্থের মূলে বসে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে ঐ গাছের নাম বোধিদ্রুম এবং স্থানটি বৌদ্ধগয়া নামে পরিচিত হয়। দিব্যজ্ঞান লাভের পর গৌতম বা সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধ' বা 'জ্ঞানী' বলে পরিচিত হন। এরপর তিনি ধর্মপ্রচার করতে শুরু করেন এবং বারাণসীর নিকট সারনাথে তিনি তাঁর ধর্মমত সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে এই ঘটনাকে 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধের প্রথম পাঁচজন শিষ্য ক্রমশ তাঁর আদেশ অনুসারে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তাঁর বাণী প্রচার শুরু করেন। কথিত আছে স্বয়ং মগধ অঞ্চলে ধর্মপ্রচার করেন এবং মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আনন্দ, মহাকাশ্যপ, সারিপুত্র, মজ্ঞলায়ন ও উপালি প্রমুখ প্রধান ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁর উদ্ভাবিত নবধর্ম সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় বা সংঘ স্থাপিত হয়। ৮০ বছর বয়সে গোরক্ষপুর জেলার কুশিনারা বা কুশীনগরে বুদ্ধদেবের দেহান্তর ঘটে। সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৫ বা ৪৮৩ অব্দে তাঁর তিরোধান হয়। তাঁর দেহত্যাগের ঘটনাটিকে 'মহাপরিনির্বাণ' বলা হয়।

মানুষের মুক্তির পথের সন্ধানলাভ করাই ছিল গৌতম বুদ্ধের লক্ষ্য, দেবতার আসনে বসিয়ে তিনি নিজেকে ভগবান্‌রুপে প্রচার করেননি। তিনি ছিলেন মানবমুক্তির পথপ্রদর্শক। সাধনা ও গভীর তপস্যার ফলে বুদ্ধদেব যে চারটি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁকে চারটি আর্যসত্য(আর্যসত্তানি) বলা হয়। এগুলি হল- ক) দুঃখ, খ) দুঃখ সমুদয়, গ) দুঃখ নিরোধ, ঘ) দুঃখ- নিরধ্মার্গ। বুদ্ধদেবের মতে এই জগতের সবই দুঃখময়। জন্ম, জরা, শোক সবই দুঃখপূর্ণ। যাকে আমরা আপাত সুখ বলে মনে করি তাঁর মধ্যেও দুঃখ প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। প্রত্যেকটি বস্তুর মতোই এই জগৎ ও জীবন অনিত্য তাই-ই দুঃখময়। গৌতম বুদ্ধের মতে সংসারে যেমন দুঃখ আছে তেমনই দুঃখের কারণও আছে। কারণ ছাড়া কোনো কাজের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। সংসারে জন্মগ্রহণ না করলে মানুষকে জরা-ব্যাধি-মৃত্যু ভোগ করতে হত না। পুনরায় জন্মলাভের বাসনা হল জন্মের কারণ। এই বাসনা হল পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তি। আর আসক্তির কারণ হল তৃষ্ণা। এর জন্যই মানুষ বারবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করে। অতএব যে

কারনে দুঃখের উৎপত্তি তাঁর বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দুঃখেরও অবসান ঘটবে। সুতরাং বুদ্ধদেবের মতে দুখ-নিরোধ বা নিবৃত্তি সম্ভব। দুঃখের নিরোধকে বৌদ্ধগণ ' নির্বাণ ' বলে থাকেন।

বুদ্ধদেব তাঁর বাণীতে ' আত্মা ' বা 'ব্রহ্ম' কথাটি ব্যবহার করেননি। তিনি তত্ত্বের কথাও বলেন নি। তিনি বলেছেন এক পথের কথা, নির্বাণ লাভের পথ। সেই পথ অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এখন নির্বাণ বলতে বুদ্ধদেব কি বলতে চেয়েছিলেন তা জানা প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্মে সত্তা হল ক্ষণে ক্ষণে জন্ম ও অবলুপ্তির এক নিরবিচ্ছিন্ন ধারা। এই ধারা চলে কার্য-কারন সম্বন্ধের নিয়মের অধীনে। জগতে চিরস্থায়ী বলে কিছু নেই এবং চিরস্থায়ী সত্তা বলেও কিছু নেই। অতএব আত্মিক বা বস্তুগত এমন কোনো পদার্থ নেই। বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি অবশ্য চতুর্যাহাসত্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা। বুদ্ধদেবের ধর্মোপদেশের মূল বক্তব্যই হল মানবমুক্তির পথ সম্বন্ধে ধারণাটি। বুদ্ধদেব একসময় বলেছিলেন যে সমুদ্রের জলের স্বাদ যেমন নোনা, তেমনই তাঁর ধর্মশিক্ষায় ' মুক্তির স্বাদ ' ছাড়া কিছু নেই। বুদ্ধদেব মানুষের জীবনকে দুঃখময় বলেছেন, তবে কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে পারলে এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই পথের নিশানাও তিনি দিয়ে গেছেন। এই মুক্তি পথের সন্ধান জানলে মানুষ কর্মবাদ উপেক্ষা করতে পারবে এবং পুনর্জন্মের যে চক্র আবর্তিত হতে থাকে তা থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারে এবং নির্বাণ লাভ করে। নির্বাণ প্রাপ্তির অবস্থায় নিয়ত পরিবরতনশীল ধর্মগুলির গতি রুদ্ধ হয়ে যায়, ফলে সংসারের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে। অর্থাৎ নির্বাণ হল পুনর্জন্মচক্রের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুনের মতে নির্বাণ এবং সংসার দুই পরস্পর-বিরোধী ব্যাপার নয়। সবকয়টি পারমিতার চর্চার ফলে এবং নৈতিক শুদ্ধতার চরম স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয়ে হয়ে যায়, ভেদ লুপ্ত হয় নির্বাণ ও জগৎ সংসার, অস্তিত্ব ও অনস্তিতের মধ্যে। সংক্ষেপে নির্বাণ হল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। তবে এর স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে বুদ্ধদেব কিছু বলেন নি । পরবর্তীকালে দুটি গ্রন্থে (সুরঙ্গমতত্ব ও লঙ্খাওবতারতত্ব) এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে নির্বাণ হল এমন সত্তা যা স্থান-কালের অতীত যা জন্ম বন্ধনে আবদ্ধ নয়, যা খণ্ডিত হয় না, যা নিত্য। এটি হল ব্যক্তিমনের বিশ্বমনের মধ্যে ডুবে যাওয়া। " অনেকের ধারণা যে নির্বাণের পথ হল ইন্দ্রিয়সহ ব্যক্তিমনের বিনাশ, জানে না যে নির্বাণ ও বিশ্বমন একই বস্তু। বিশ্বমনের মৌলিক সত্তা আছে যেটি চৈতন্যময় সত্তা এবং বোধিরুপে বিরাজমান। এই বিশ্বমনের জ্ঞানক্রিয়া ঘটে না। নির্বাণ লাভের পর ব্যক্তিমন তাতে বিলীন হয়ে যায়। নির্বাণ দীপশিখা নির্বাণের মতো নয়, ব্যক্তি-মনের বিশ্বমনের সহিত একীভূত হওয়া।"

বিষয়াসক্তি বর্জন করে এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণভাবে বশীভুত করে সর্বদা সত্যের ধ্যান করলে জীবনে নিজ প্রচেষ্টায় নির্বাণ লাভ সম্ভব। যে পথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে চিরমুক্তি সম্ভবপর বুদ্ধদেব সেই পথকে দুখ-নিরোধ্মার্গ বলেছেন। এই পথের আটটি অঙ্গ বা স্তর আছে। সেইজন্য এই পথকে বলা হয় ' অষ্টাঙ্গিক মার্গ ' ।একদিকে অত্যধিক শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন এবং অপরদিকে অসংগত ইন্দ্রিয়সুখ--- এই দুই চরম পথ পরিহার করে মধ্যবর্তী পথ (মধ্যপন্থা) অনুসরণ করবার জন্য বুদ্ধদেব তাঁর অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে নির্দেশ করেছেন। আটটি পথ হল—সৎবাক্য, সৎ ব্যবহার, সৎ চিন্তা, সৎ জীবন, সৎ শ্রম, সৎ স্মৃতি, সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সমাধি। মিথ্যা কথা না বলা, পরনিন্দা না করা, কাকেও রুঢ় কথা না বলা হল সৎ বাক্য। ন্যায়সঙ্গত আচরণ, চুরি না করা, কোনজীবকে হিংসা না করা, এসব সৎ ব্যবহার। ভোগবিলাস ত্যাগ করে সৎ জীবন যাপন করা, সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জন করা হচ্ছে সৎ শ্রম। মন থেকে সমস্ত রকম অশুভ, অসৎ চিন্তা দূর করা, সর্বদা সৎ চিন্তা দিয়ে মনকে পূর্ণ রাখা হল সৎ চিন্তা। বুদ্ধদেব দুঃখ সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন সেগুলি যারা বুঝতে পারে এবং বিশ্বাস করে একমাত্র তারাই সম্যক দৃষ্টি বা সত্য জ্ঞান লাভ করতে পারে। সম্যক সঙ্কল্প হল সম্যক স্মৃতি। এইভাবে দেহ-মনকে বিশুদ্ধ, সংহত ও শান্ত করে ধীর ও

স্থিরভাবে সাধন ও ধ্যান করাকেই সম্যক সমাধি বলা হয়। তাঁর ধর্মমত আলোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নতি, অহিংসা, করুণা এবং মৈত্রীর ওপর নিজস্ব ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য একটি সংঘ স্থাপন করেছিলেন। পরে সংঘ বৌদ্ধধর্মের অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত লিপিবদ্ধ করে রেখে যাননি। তাঁর উপদেশাবলি মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধসঙ্গীতি বা ধর্মসম্মেলনে বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি আবৃত্তি করা হত। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর মত ও বাণীগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থগুলি পালি ভাষায় লিখিত। এগুলিকে পিটক বলা হয়। পিটকের সংখ্যা তিনটি। সেজন্য এদের ' ত্রিপিটক ' বলা হয়। এগুলি হল বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধম্মপিটক। বিনয়পিটকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুগন কোন কোন নিয়ম বা আচারন অনুসরন করবে তা লেখা আছে। সুত্তপিটকে ছোট ছোট গানের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের ধর্ম, উপদেশ, বাণী ও মত লিপিবদ্ধ আছে। বুদ্ধদেবের বচনের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও ভাষ্য অভিধম্মপিটকের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বৌদ্ধভিক্ষুরা যাতে সকলে একত্র হয়ে ধর্ম আলোচনা করতে পারে সেজন্য বুদ্ধদেব তাঁদের নিয়ে বৌদ্ধসংঘ গড়ে তুলেছিলেন। প্রথমে মেয়েরা সংঘে যোগ দিতে পারত না। পরে তাঁদের নিয়ে একটি সম্পূর্ণ পৃথক সংঘ গড়ে তোলা হয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ- এই তিনটি হল বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিশ্যরা রাজগৃহে একটি মহাসম্মেলন বা সঙ্গীতি আহ্বান করেন এবং সেখানে বৌদ্ধধর্মের নীতি ও শিক্ষাগুলিকে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়াও বুদ্ধদেব মানুষকে কয়েকটি সাধারণ নীতি অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন, যথা- হিংসা না করা, চুরি না করা, মিথ্যাকথা না বলা, অর্থলিপ্সা ত্যাগ করা, জীবহত্যা বন্ধ করা ইত্যাদি। বহুঘোষিত পঞ্চশীলের কথাও তিনিই বলেছিলেন। এগুলি হল হিংসা, পরস্বাপহরন, ব্যাভিচার, মদ্যপান, মিথ্যাভাষন থেকে বিরত থাকা, মনঃসংযোগ ও অন্তর্দৃষ্টি। এগুলির দ্বারা তিনি ব্যক্তি-মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠন করার চেষ্টা করে ক্ষমা ও মৈত্রীর ভিত্তিতে মানবজীবনকে গড়ে তোলা সম্ভব বলে তিনি মনে করেছিলেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম শেষের দিকে ভয়ঙ্কর অদৃষ্টবাদী এবং দেবদেবীর ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল। অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বুদ্ধদেব সেই সময় মানুষকে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করে তুলেছিলেন, কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও ভয়ের বিরুদ্ধে সেদিন তিনিই বিদ্রোহের বাণী শুনিয়েছিলেন।

জাতিভেদকে অস্বীকার করে বুদ্ধদেব সমস্ত মানুষকে সমান অধিকার দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ থেকে সম্রাট পর্যন্ত সব মানুষের সমান অধিকার ছিল বৌদ্ধসঙেঘ। বৈদিকযুগের শেষে সমাজে নারীর অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসে। বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মাচরণে নারী ও পুরুষের অধিকার প্রায় সমানভাবে মেনে নিয়েছিলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শেষদিকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একাধিপত্য ধর্মের ক্ষেত্রে প্রায় তাঁদের উগ্র একনায়কত্বের সামিল করে তুলেছিল। তাঁর তুলনায় বৌদ্ধ সংঘগুলির গঠন ছিল অনেক গণতান্ত্রিক। কোন বিশেষ শ্রেণীর একাধিপত্য সেখানে ছিল না। ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শে উজ্জীবিত বৌদ্ধধর্ম মানুষকে শান্তিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়েছিল, মানুষের সমাজে হিংসা ও হানাহানির পরিবর্তে মানবিক প্রেম ও

ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিল। এইসব গুরুত্ব ও তাৎপর্যের জন্য বুদ্ধের বাণী ভারত এবং ভারতের বাইরের জনসমাজে বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল।

উপনিষদ ও বৌদ্ধধর্ম ঃ- অনেকের মতে বৌদ্ধধর্ম হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। Maxmuller says, " To my mind having approached Brahmanism after a study of the ancient religion of India, the religion of the Vedas Buddhism has always seemed to be not a new religion, but a natural development of the Indian mind in its various manifestations, religious, philosophical, social and political." অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম হল ব্রাহ্মণ্যধর্মের মুলনীতির রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শাস্ত্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ। এটি নতুন ধর্মমত নয়। অধ্যাপক হপকিন্স ও একই রকম মন্তব্য করেছেনঃ " The founder of Buddhism did not strike out a new system of morals, he was not a democrat; he did not originate a plot to overview the Brahmanic priesthood; he did not invent the order of monks." অর্থাৎ বুদ্ধদেব নৈতিকতার ক্ষেত্রে নতুন কিছু বলেননি, তিনি পুরোহিতদের ক্ষমতা বা প্রভাব ধ্বংস করতে চাননি, সন্ন্যাসী সংঘ স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি পথিকৃৎ নন। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, বুদ্ধদেব বেদের আরণ্যক ও উপনিষদের ক্ষেত্রে বহু কিছু নিয়েছিলেন এবং উপনিশদে যে সব তত্ব রয়েছে সেগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁর ধর্মমত গড়ে তোলেন। বৌদ্ধধর্মমত ও উপনিষদগুলির মধ্যে যে একটা যোগসুত্র আছে তা সহজেই অনুমেয়। তাছাড়া ষড়দর্শনের সঙ্গেও বুদ্ধদেব পরিচিত ছিলেন। তাঁর ধর্মমতে কপিলের সাংখ্য দর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমতঃ উপনিষদের মতাদর্শের মতো বৌদ্ধধর্ম পুনর্জন্মবাদ, কর্মবাদ, মুক্তি বা নির্বাণের তত্ব গ্রহণ করেছে। আত্মা অবিনাশী না মানলেও আত্মিক শক্তি যে অবিনাশী তা বৌদ্ধধর্ম মনেপ্রানে গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধশাস্ত্রকার অশ্বঘোষের ' বুদ্ধচরিতে' উল্লেখ আছে যে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভের আগে অরাড় মুনির আশ্রমে যান এবং সেখানে অরাড় মুনি তাঁকে মোক্ষ বিষয়ে যে উপদেশ দেন সেগুলি বুদ্ধদেবকে প্রভাবিত করে। ' বুদ্ধচরিতে' ২৫টি তত্বের উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির উৎস হল উপনিষদ ও ষড়দর্শন।

ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দার্শনিক চিন্তা জাতির সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল। ভাষা যেমন কার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এইসব চিন্তাও তেমনই কোন ব্যক্তি-বিশেষের ছিল বলে নির্দিষ্ট করা যায় না। সকলেরই তাতে সমান অধিকার ছিল। এ কারণেই উপনিষদের কতকগুলি তত্ব সকল দর্শনেই লক্ষ্য করা যায়। প্রথম তত্ব হল পুনর্জন্ম, পুনর্ভব বা সংসারবাদ। মৃত্যুর পরে জীবাত্মা কর্মানুসারে মানুষ বা মনুষ্যেতর জীব বা উদ্ভিদ দেহে জন্ম নেয়। এই মতটি বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত। **দ্বিতীয়ত**, আত্মার (বৌদ্ধধর্মে আত্মিক শক্তি) অমরতা সকল দর্শনেই স্বীকৃত। আত্মার অমরতার সঙ্গে জন্মান্তরের নিবিড় সম্পর্ক এবং এই জন্মান্তর নানা দুঃখের আকর বলে এ থেকে মুক্তি সকল দর্শনের কাম্য। বুদ্ধদেব মুক্তির স্থানে ' নির্বাণ ' কথাটি গ্রহণ করেন। তৃতীয়ত, কর্মবাদ- প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য এবং কর্মের ফল থাকবেই এবং এর ফলেই জীবকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। এটাই কর্মবাদ। বুদ্ধদেব এতি স্বীকার করেছেন। চতুর্থত, জীবন দুঃখময় এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় নির্ধারণ। উপনিষদ ও ষড়দর্শনে মুক্তির উপায় যেভাবে বর্ণিত হয়েছে বুদ্ধদেব একই পথ অনুসরণ করে নিজস্ব মত প্রকাশ করেন। বৈদিক ঋষিরা সাধনার দ্বারা যে সত্য লাভ করেন তাই উপনিষদে নিবদ্ধ আছে। বুদ্ধদেব উপনিষদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বেদ অপৌরুষেও নয় বলেছেন। এতে কিছু নতুনত্ব নেই। ন্যায়দর্শনেও বেদ মানুষের সৃষ্ট বলে মনে করে। উপনিষদে এবং মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। বুদ্ধদেব যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন তাতেও নতুনত্ব নেই।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে মতভেদের উদ্ভব হয়।এই মতভেদের ফলে প্রায় ৩০ টি দর্শনের উদ্ভব হয়। বুদ্ধদেব তাঁর প্রচারিত ধর্মের তাত্বিক আলোচনা নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন বৌদ্ধ দর্শনে গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমুহ আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধদেব যা প্রচার করেছিলেন তাঁর সমর্থনের জন্য সময়ে সময়ে তাঁকে জগতের কর্মনীতি স্বরূপের আলোচনা করতে হয়েছিল। বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে চারটি প্রধান—মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ, বৈভাষিক বা বিজ্ঞানবাদ বা যোগাচারবাদ, বাহ্যানুমানবাদ বা সৌত্রান্তিকবাদ এবং বৈভাষিকবাদ। মাধ্যমিক দর্শন অনুসারে মানসিক অথবা অমানসিক কোন বস্তুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, সবই শূন্য। যোগাচারে মনোবাহ্য জগতের অস্তিত্ব নেই, মানসিক বস্তুরই কেবল অস্তিত্ব আছে। সৌত্রান্তিকবাদে মানসিক এবং মনোবাহ্য উভয়বিধ বস্তুরই অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় না, তা অনুমানগম্য। প্রত্যেক বস্তুই সদা-পরিবরতনশীল, তাঁর অস্তিত্ব ক্ষণিক, এটাও একটি বৌদ্ধমত। বৌদ্ধদর্শনের এই শাখাগুলিতে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি ষড়দর্শনের কোন না কোনটিতেই বলা হয়েছে। অশ্বঘোষের ' বুদ্ধচরিত' থেকে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। সাংখ্য ও ন্যায়দর্শনের প্রভাব থেকে বৌদ্ধদর্শন মুক্ত হতে পারেনি। বৌদ্ধধর্মে নির্বাণের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। অবিদ্যার অবসানে নির্বাণ লাভ হয় এ কথা বৌদ্ধধর্মে বলা হয়েছে। উপনিষদের মোক্ষ বা মুক্তির সঙ্গে তুলনা করলে নির্বাণের কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। মুক্তিতে জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। সেটা পরম আনন্দের অবস্থা। এই ভাব কিরূপ তা আমাদের ধারনার বাইরে। বুদ্ধদেবও নির্বাণ লাভের এরূপ অবস্থার কথা বলেছেন। ' বুদ্ধচরিতে' বলা হয়েছে জীবগনের সংস্কারচক্রে আবর্তনের মূলে অজ্ঞান, কর্ম ও বিষয়তৃষ্ণা বর্তমান। অবিদ্যা থেকে জীবের বন্ধন ও সম্যক জ্ঞান থেকে তাঁর মুক্তি। অতএব মুক্তি ও নির্বাণের মধ্যে পার্থক্য নেই।

বুদ্ধদেব যে সংঘ স্থাপন করেছিলেন তাঁর ধারণা তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম থেকেই পেয়েছিলেন। পরবর্তী বৈদিক যুগে যে চতুরাশ্রমের কথা আছে তাঁর মধ্যে তিনটি আশ্রমই সন্ন্যাসী জীবন যাপনের উপর ভিত্তি করে। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে দুপ্রকার ব্রহ্মচারী বা শিক্ষার্থীর স্থান ছিল- উপকুরবন এবং নৈষ্ঠিক। প্রথম শ্রেণী শিক্ষালাভের পর গারহস্ত আশ্রমে প্রবেশ করত। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রহ্মচারী সংসারধর্ম পালন করত না, বৌদ্ধধর্মের ভিক্ষুদের মতো জীবনযাপন করত। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস জীবন যারা যাপন করতেন তাঁদের সঙ্গে বৌদ্ধ-শ্রমণদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ব্রহ্মচারীদের জন্য যেসব নিয়মকানুন ছিল বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্যও একইপ্রকার নিয়মকানুন প্রবর্তন করা হয়। বুদ্ধদেব অহিংসার ওপর জোর দিয়েছেন। এই অহিংসার কথাও উপনিষদে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। উপনিষদের ব্রহ্মচারীদের কৃষিক্ষেত্র দিয়ে চলতেও নিষেধ করা হয়েছে, কারণ তাতে জীবহত্যা হবার আশঙ্কা থেকে যায়।

সংসারের দুঃখ- কষ্ট থেকে মানুষ যাতে মুক্তি পায় বুদ্ধদেব তাঁর জন্য পথনির্দেশ করেন। উপনিষদে যাজ্ঞ্যবল্কও এরূপ পথনির্দেশ করেছিলেন এবং জগত যে দুঃখময় এরও উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধদেব যে-সব জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন সে সব প্রশ্ন উপনিষদে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, সৎ -অসৎ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের ধারণা সাংখ্যদর্শনে এ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে সেগুলিরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। এ কারনেই অধ্যাপক জেকোবি লিখেছেন, " Buddhism was derived from Sankhya."

বুদ্ধদেব নিজে ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। ' ললিতবিস্তার' গ্রন্থে বলা হয়েছে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই বুদ্ধদেবের পুনর্জন্ম হতে পারে। বৌদ্ধদর্শনে এরূপ উল্লেখ আছে যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করতে ব্রাহ্মণদের কোন বাধা ছিল না।

উপসংহারে বলা যায় যে ক্ষমা, মৈত্রী ও করুনার আদর্শে উজ্জীবিত বৌদ্ধধর্ম মানুষকে শান্তিপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়েছিল, সমাজে হিংসা ও হানাহানির পরিবর্তে মানবিক প্রেম ও ভ্রাত্তিত্বের আদর্শকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিল। আর এসব কারনেই গৌতম বুদ্ধের বাণী কেবলমাত্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও জনসমাজে বিপুল সমর্থন করেছিল।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ-

1) Genesis of Buddhism-Its Social Content- B.N.Mukherjee.

2) Political History of Ancient India-H.C.Raychowdhury.

3) Religions of Ancient India- L. Renou.

4) The Religion and Philosophy of the Vedas and Uponisads- A. B. Keith.

৫) অতীতের উজ্জ্বল ভারত- এ, এল, ব্যাসাম।

৬) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস(প্রথম খণ্ড)- সুনীল চট্টোপাধ্যায়।

৭) ভারতবর্ষের ইতিহাস- রোমিলা থাপার।

সম্ভাব্য প্রশ্নমালাঃ-

১) পবরতী বৈদিক যুগে শ্রেনীবিভক্ত সমাজে সর্বচ্চ আসনে কারা ছিল? (২)

২) কোন ঘটনাকে ' মহানিস্ক্রমন' বলা হয় ? (২)

৩) বুদ্ধদেবের কোথায় এবং সম্ভবত কত খ্রিষ্টাব্দে তিরোধান হয় ? (২)

৪) বুদ্ধদেবের শিষ্যদের মধ্যে কারা প্রধান ছিলেন? (২)

৫) চারটি আর্যসত্য কি কি ? (২)

৬) নির্বাণ কথার অর্থ কি ? (২)

৭) বৌদ্ধধর্মে ' মধ্যপন্থা ' কাকে বলে? (২)

৮) অষ্টাঙ্গিকমার্গ কাকে বলে ও কি কি ? (২)

৯) বৌদ্ধধর্মে সংঘ কি ? (২)

১০) ' ত্রিপিটক ' কাকে বলা হয় ? (২)

১১) ত্রিরত্ন কি ? (২)

১২) পঞ্চশীল নীতি কি ? (২)

১৩) অশ্বঘোষের গ্রন্থের নাম কি ? (২)

১৪) বৌদ্ধধর্মের ওপর উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর । (৫) (১০)

১৫) বৌদ্ধদর্শনের উৎপত্তি ও সেগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা কর । (৫) (১০)

১৬) বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা কর । (৫) (১০)

১৭) ঔপনিষদিক ধর্মের সহিত বৌদ্ধধর্মের তুলনামূলক আলোচনা কর । (৫) (১০)

১৮) গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও বাণী ব্যাখ্যা কর । (৫) (১০)